বাঙালির অর্থনীতিক চিন্তা

সৌম্যব্রত চক্রবর্তী

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা ও বাঙালির অর্থনৈতিক বনিয়াদটি ছিল যথেষ্ট পোক্ত– স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজ ভিত্তিক, কৃষি ও কুটিরশিল্প ছিল যার অবলম্বন। সূতি, রেশম, পশমবস্ত্র এবং ঢাকার মসলিনের তখন জগৎজোড়া নাম। বাঙালি বণিকসমাজ এই বস্ত্রসম্ভার বিদেশে রপ্তানি করে উপার্জন করতো প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা। গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন ছিল 'বারোমাসে তেরো পার্বন' –যাত্রা, তরজা, পাঁচালি, কবিগান, কীর্তন, বাউল গান, পালা গান, মেলা– তেমনি অপরদিকে ছিল টোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা আবর্তিত বাঙালী মণীষার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের 'বারমাস্যা'। ধনী-গরীবের ভেদাভেদ থাকলেও এদেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে পড়েনি কোনো ছাপ– স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনেও পরিলক্ষিত হয়নি কোনোরূপ তারতম্য।

বাঙালি অর্থনীতিক জীবনে কিন্তু বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে পলাশী (১৭৫৭ খ্রিঃ) ও বক্সারে (১৭৬৩ খ্রিঃ)র যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর। 'বণিকের মানদন্ড' তখন 'দেখা ছিল রাজদন্ডরূপে'। একদিকে কোম্পানীর বল্গাহীন দুর্নীতি ও অর্থলোলুপতা এবং পরবর্তীতে প্রভুত্ব রাজস্ব সংগ্রহে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রিঃ) নির্ভর ভূমিব্যবস্থা বাঙালি গ্রামীণ সমাজকে ঠেলে দেয় চরম ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে। সঙ্গে যুক্ত হয় অবাধ বাণিজ্য নীতি (১৮১৩ খ্রিঃ)। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা নিজেদের স্বার্থে ভারতীয় কুটির শিল্প ধ্বংসের যে পথ প্রস্তুত করে তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বস্ত্র উৎপাদনকারী বাংলার হস্ত ও কুটির শিল্প। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার কারিগর ও বস্ত্রশিল্পীকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়ে ভীড় জমাতে হয় কৃষিক্ষেত্রে। এই প্রক্রিয়াতেই উৎপত্তি ঘটে ভূমিবিহীন কৃষিমজুর শ্রেণীর। ভারতের সঙ্গে বাংলাও পরিণত হয় ব্রিটিশ ধনতন্ত্র বিকাশের উপনিবেশে। মাত্রাহীন শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত হতে থাকে বাঙালি জনজীবন। এককালের স্বপ্ন কৃষকের রূপান্তর ঘটে ভিক্ষুকে। ভিক্ষাবৃত্তি, অনাহার, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কেড়ে নিতে থাকে শত শত মানুষের প্রাণ।

মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের যে অংশের সঙ্গে অর্থোপার্জন ও ব্যয়ের সম্পর্ক যুক্ত, তাকে কেন্দ্র করেই অর্থনীতিক চিন্তাধারার আবর্তন ও বিচরণ। আবেগপ্রবণ জাতি হিসাবে বাঙালি চিহ্নিত হলেও বস্তুগত বিষয়ভিত্তিক অর্থনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনাতেও তার খামতি নেই। দশম শতাব্দীর চর্যাপদের যুগ থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা, গীতিকা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতিতে বাঙালির অর্থনীতিক চিন্তার ছাপ থাকলেও তা এত বিক্ষিপ্ত যে তাকে একসূত্রে গাঁথা যায় না। ব্রিটিশ অপশাসনে সারা ভারতের সঙ্গে বাংলারও চরমদুর্দশা, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শোষণ ও ক্রমাগত সম্পদ নিষ্কাশনের (Economic Drain) মধ্যেই উনিশ শতকে প্রবর্তিত হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মণীষা বৌদ্ধিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তখন যে কোনো ঘটনা তর্ক ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে শিখেছে। ঘটছে নবজাগরণের তখন ঊষাকাল। ধর্মীয় ও সমাজসংস্কারের সঙ্গে প্রসার ঘটছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের। এমন এক যুগসন্ধিক্ষণেই রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তিনিই প্রথম ভারতীয় বাঙালি যিনি ভারতের ভূমি ব্যবস্থা, কৃষি জীবন, রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সম্পদ নিষ্কাশন সম্পর্কে যে চিন্তা ভাবনার অবতারণা করেন তা এককথায় অতুলনীয়। বাঙালির অর্থনীতিক চিন্তার এই পরিক্রমায় প্রথমে আলোচিত হবে প্রথিতযশা সমাজ সংস্কারক, সমাজসচেতক চিন্তাবিদ, স্বদেশপ্রেমিক, সাহিত্যস্রষ্টা, সিভিলিয়ান এবং মানবপ্রেমিক বিশ্বকবির ভাবনা চিন্তা। যার শুরু রাজা রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা দিয়ে।

১

(ক) রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

নবজাগরণের অগ্রদূর প্রথম বিলেতযাত্রী ভারতীয় বাঙালি রামমোহন রায় পেশাগত জীবনে অর্থনীতিবিদ না হয়েও ১৮৩৩ খ্রিঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গঠিত সিলেক্ট কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে সাক্ষ্যদানকালে ভারতের কৃষি ও রাজস্ববিষয়ক যে বক্তব্য উত্থাপিত করেন তা তাঁকে তৎকালীন বিশ্ব অর্থনীতির তাত্বিক চিন্তার ধারক জেমস মিল, ডেভিড রিকার্ডো, টমাস ম্যালথাস জেরমি বেন্থাম প্রমুখের সমতুল্য করে তোলে। তিনি তাঁর বিশ্লেষণে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৭৯৩ খ্রিঃ বাংলা-বিহার-উড়িশ্যায় প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৮২০ খ্রিঃ দক্ষিণ ভারতে লাগু রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে ডেকে এনেছিল চরম দুঃখ ও দুর্দশা। নিজে জমিদার হয়েও তাঁর প্রস্তাব ছিল ভূমি স্বত্বে জমিদারের মতো চাষীরও চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকা আবশ্যক। তিনি মনে করতেন, চাষীর প্রদেয় খাজনার পরিমাণ থাকবে নির্দিষ্ট[যখন তখন জমিদারের খেয়ালখুশিমতো তা বৃদ্ধির চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকা অনুচিত। নির্দিষ্ট খাজনা ছাড়াও জমিদাররা যে বাড়তি কর আদায় করতো, অনাদায়ে রায়ত-কৃষককে উৎপীড়ন, নির্যাতন, জমি কেড়ে নিয়ে ভিটে ছাড়া করে পথের ভিখারী পর্যন্ত বানানোর জ্বলন্ত ও মর্মন্তুদ ঘটনার তথ্য প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন। তিনি মনে করতেন, রায়ত - কষকের দুরবস্থা ও দুর্দশা দূরীকরণে প্রয়োজন ভূমিকর হ্রাস এবং তাতেই ঘটবে তার আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ। চাষীর উপর আর্থিক চাপ কমাতে প্রয়োজনে তিনি বিলাস পণ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় নয় এমন পণ্যের উপর কর আরোপের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (Public Finace) সর্বাধুনিক প্রগতিশীল কর ব্যবস্থাও অনুরূপ মতবাদ ব্যক্ত করে।

রাজা রামমোহনই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অডিটরের তথ্য উদ্ধৃত করে ভারত থেকে বিলেতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ চালানের (Wealth Drain) প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (১৮৩২ খ্রিঃ)। তাঁর প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ঐ সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানী প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ পাউন্ড ষ্টার্লিং এবং ব্যক্তিগত স্তরে আরও ২০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং অর্থ ভারত থেকে বিলেতে চালান দিতো। পরবর্তীকালে (১৮৭১ খ্রিঃ) দাদাভাই নৌরজির বিখ্যাত 'সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্ব'টির (Drain Theory) মূল উপজীব্য বিষয় ছিল এটিই। কোনোরূপ প্রতিদান ছাড়াই এক দেশ থেকে অন্য দেশে একতরফা (Unilateral) সম্পদ হস্তান্তর প্রক্রিয়াই 'সম্পদ নিষ্কাশন' নামে পরিচিত। সরকারী নথি ঘেঁটে রামমোহন দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ১৭৬৫-১৮২০ খ্রিঃ সময়সীমায় ভারত থেকে বিলেতে সম্পদ চালানোর পরিমাণ ছিল ১১ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং, যদিও ঐ নথিতে সেনাবিভাগের তথ্য, ভারতের স্বাধীন কর্মরত ব্রিটিশ ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর পাঠানো সম্পদের পরিসংখ্যান তিনি সংগ্রহ করতে সফল হয়নি। ঐ পরিসংখ্যানগুলি সংগৃহিত হলে বাস্তবে সম্পদ হস্তান্তরের পরিমাণ হতো আরও অনেক বেশী।

(গ) রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮ - ১৯০৯)

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের এক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী (সিভিলিয়ান) ও সাহিত্যস্রষ্টা রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দাদাভাই নৌরজী (১৮২৫-১৯১৭) ও আইনজ্ঞ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২ - ১৯০১)-র সমসময়িক। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল, কৃষির ক্রমাবনতি, ভারতীয় কৃষকদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্য খরা ও দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যু, সম্পদ হস্তান্তর প্রভৃতি নিয়ে বিস্তর অনুসন্ধানের পর প্রকাশ করেন তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ ও অত্যন্ত মূল্যবান (দু'খন্ডে) 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' (Economic History of India) 'ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলাফলের উপর আলোকপাত করাই ছিল তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের কৃষিই একমাত্র হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় সম্পদ সংগ্রহের উৎস। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে ক্রমশঃ অধিকতর রাজস্বের লোভে তাকে শোষণ করতে করতে পঙ্গু করে ফেলা হয়। কৃষির স্বাস্থ্যোদ্ধারে তার উদ্বৃত্ত সেখানেই ফিরিয়ে দিয়ে তাকে উৎপাদনশীল করার নীতিতে ব্রিটিশ শাসকরা বিশ্বাসী না হওয়ায় সেখানে দ্রুত নেমে আসে ক্রমাবনতি, নেমে আসে বিপর্যয়। আর কৃষি সমাজে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য। খরা ও দুর্ভিক্ষে জর্জরিত হয়ে পড়ে সারা দেশ। ঘটতে থাকে শত শত অনাহারে মৃত্যু। তাঁর বিশ্লেষণানুযায়ী বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষে শত শত মৃত্যু কৃষি উৎপাদন হ্রাসের কারণে খাদ্যদ্রব্যের অভাবে নয়, ক্রয়ক্ষমতার অভাবে সক্ষমতার ঘাটতি (Resourcelessness) ই ডেকে এনেছিল এই নরমেধ যজ্ঞ। তিনি তথ্যসহ দেখিয়েছেন শুধুমাত্র চড়াহারে (৫০ শতাংশ বা তার বেশী) ভূমি রাজস্বই নয়, সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান আরও বহুবিধ করভারে জর্জরিত ছিল বাংলার কৃষি সমাজ। রাজস্ব সংগ্রহে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ, অকথ্য নির্যাতন এবং অত্যাচার চালাতেও পিছপা হতো না ব্রিটিশ শাসক এবং তাদের দোসর জমিদার ও সামন্ত প্রভুরা। আর সেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ চালান (Drain of wealth) যেত বিদেশে। রমেশচন্দ্র দত্তের বিশ্লেষণে ব্রিটিশ শক্তির শোষণের বলগা এখানেই থেমে থাকেনি, তা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল অসম ও ন্যায়বর্জিত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও! অনবদ্য বিশ্লেষণে তিনি দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন অবাধ বাণিজ্য নীতি (Free Trade) তে বিশ্বাসী হয়েও ব্রিটিশরা ঐ সময়ে একদিকে ভারতীয় বিশেষতঃ সূতি ও সিল্ক বস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের উপর অত্যন্ত চড়া হারে মাশুল বসিয়ে কিংবা বিভিন্ন বিধি নিষেধ জারী করে এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ পণ্যের উপর কোনো মাশুল ব্যতীত অথবা নামমাত্র হারে মাশুল বসিয়ে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধংসের পথ প্রশস্ত করে। এই প্রক্রিয়াতেই ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমশঃ রক্তশূন্য রোগীর মতো নিস্তেজ হতে হতে চরম অনুন্নতি ও দারিদ্র্যের দিকে নেমে যায়।

রমেশচন্দ্রের মতে, ভারতীয় কৃষি অর্থনীতির পক্ষে অত্যাবশ্যক সেচ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত শিল্পজাত পণ্য বিপণনের স্বার্থে ভারতের সুবিশাল বাজার দখল করাই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের ভারতে রেলপথ পত্তনের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রক্রিয়াতেই একদা সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র রপ্তানিকারী দেশের বদলে ভারত পরিণত হয় কাঁচা তুলা, কাঁচা পাট প্রভৃতির মতো উপকরণ সরবরাহকারী দেশে। তাই তিনি ভারতে রেলপথ পত্তন এবং প্রসারমূলক কাজকে চিহ্নিত করেছেন 'সরকারী রাজস্বের অনুৎপাদনশীল ব্যয়' (Unproductive expenditure of The Govemment's revenue) হিসাবে। তাছাড়া ঐ সময়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দ্বারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির ভারতবাসীদের উপর কোনো ইতিবাচক প্রভাবও তিনি লক্ষ করেননি। তাঁর মতে আধুনিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কৃষি থেকে শ্রমিক শ্রেণীর একটা অংশকে সরিয়ে এনে শিল্পে নিয়োগ করে কৃষির মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি এবং শিল্প শ্রমিকদের কৃষি পণ্যের প্রতি সক্রিয় চাহিদা (Effective Demand) বৃদ্ধির যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চালু আছে ভারতের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। তাই তিনি আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের চেয়ে ভারতের চিরাচরিত গ্রামীণ, কুটির ও হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নেই বেশী উৎসাহী ছিলেন।

(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১)

ঊনিশ শতকে বাংলার মনীষীদের মধ্যে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অনন্য ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতো যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক, মানবতাবাদী এবং আপোষবিহীন সমাজসংস্কারক এ দেশে দুর্লভ। মূলতঃ সাক্ষরতা আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বহু বিবাহ রদ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের মতো সমাজ সংস্কারমূলক কাজে নিবেদিতপ্রাণ হলেও তিনিই কিন্তু শিক্ষা যে মানব সম্পদ উন্নয়নের সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে শুধুমাত্র যে মানব সম্পদেরই উন্নয়ন ঘটে তা নয়, তা আবার সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীকে মুক্ত করে তার ক্ষমতায়নের পথকেও দৃঢ়তর করে। বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টিতেই ধরা পড়ে নারীকে সুশিক্ষিত করতে পারলে পরিবার ও সমাজে নারীজাতির অবস্থান যথোপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ২০০০ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদেন (Human Development Report) সহস্রাব্দের লক্ষমাত্রায় (Millennium Goals) অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ও নারীর

ক্ষমতায়ন (Woman Empowerment) -এর উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। এখানেই বিদ্যাসাগরের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা। তিনি চেয়েছিলেন মাতৃজাতির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের সন্তানদের মধ্যে মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ উন্নতি। সঠিকভাবেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ছেলে ও মেয়ে– উভয়েরই রয়েছে শিক্ষার প্রয়োজন ও সমান অধিকার। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বহুবিবাহ রদকে বিধিবদ্ধ আইনে রূপান্তরে তাঁর যুক্তি ছিল 'বিবাহিত নারীর নিরাপত্তা ও বৈষয়িক পুনর্বাসন'কে সুনিশ্চিত করা। নারীর ক্ষমতায়নের এটিও একটি বিশেষ দিক।

(ঙ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় মধ্যযুগীয় ইতিহাস ও তৎকালীন সমাজের সংমিশ্রণ ঘটলেও স্বদেশীচিন্তা ও দেশপ্রেমমুখর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সূচনাপর্বে রেজা খাঁর অত্যাচার, মানুষের সর্বস্বান্তরূপ, একদা সমৃদ্ধ জনপদের হতশ্রী চেহারা ও মহামারীর যে ভয়াবহ নিখুঁত চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা শুধুমাত্র অনবদ্য এবং তুলনারহিতই নয়, তা তাঁর সুস্পষ্ট আর্থিক বিষয়ে চিন্তাধারারই ফলশ্রুতি। 'কমলাকান্তের দপ্তর' -ও বিড়ালের জবানবন্দীতে ব্যক্ত হয়েছে সমসাময়িক গরীব, নিঃস্ব, দীন তথা সর্বহারাদের খেদ ও যন্ত্রণা। 'আমার মন' প্রবন্ধে যেন 'লাঙল যার জমি তার' আওয়াজের প্রতিধ্বনি। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে কৃষক - প্রজাদের দুর্দশার কারণসহ যে চমকপ্রদ চিত্রের প্রস্ফূরণ ঘটেছে তাঁর তির্যক লেখনীতে তা এক কথায় অনবদ্য... ''প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমিদারেরা কস্মিনকালে নহেন– কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্নওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপথের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।'' বঙ্গিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নিখুঁত ভাবে ধরা পড়েছে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তর মতো অগণিত হিন্দু-মুসলমান কৃষকের অন্তহীন দুর্দশার কারণ, যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত হাড়ভাঙা শ্রম সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও অনাহার নিত্য সহচর। যার মূল কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট সামন্ততন্ত্র - জমিদার-মহাজনদের লাগামহীন অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ। বাংলার কৃষকদের নিদারুণ ঋণগ্রস্ততায় ব্যথিত হয়ে তাঁর কাতরোক্তি, 'বাংলার কৃষক জন্মায় ঋণ লইয়া, মরে ঋণ লইয়া। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঋণের বোঝা চাপাইয়া যার উত্তরাধিকারীদের স্কন্ধে।' এ দায় থেকে এখনও কি তাদের মুক্তি ঘটেছে?

(চ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বিশ্ববন্দিত সাহিত্যকৃতির সঙ্গে মানবতাবাদী দৃষ্টিতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতি আলোকপাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ সিদ্ধহস্ত। তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ না হয়েও মানবতাবাদীর দৃষ্টিতেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মাটির মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ, দুর্দশা এবং আর্থিক সমস্যা। তাঁর স্বদেশ - সমাজ, লোকহিত, পল্লী প্রকৃতি, সমবায় নীতি, রায়তের কথা, কালান্তর, রাশিযার চিঠি প্রভৃতি রচনায় প্রকাশ ঘটে অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার। এই চিন্তা ভাবনা মূলতঃ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। তিনি শুধুমাত্র চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েই থেমে থাকেননি। বাস্তবে শ্রীনিকেতন– শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী সুরুল গ্রাম ও সন্নিহিত আদিবাসী প্রধান পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে প্রয়াসী হয়েছিলেন হাতে কলমে সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের মাধ্যমে আপামর পল্লীবাসীর সার্বিক উন্নয়নের। তাঁর প্রদর্শিত গ্রামীণ উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীর স্বীকৃতি মেলে স্বাধীনোত্তর ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গৃহীত সমষ্টি উন্নয়মূলক প্রকল্পে (Community Development Projects)। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার ব্যাপ্তি ছিল কৃষি ও কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ ও হস্তজাত শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে কর্মনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এবং সমবায় আন্দোলন প্রসারে– এক কথায় পল্লী সংগঠনের সার্বিক উন্নতিই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধান জ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন দারিদ্র্য দূরীকরণে উৎপাদন ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রয়োজন থাকলেও তার সুফল থেকে সাধারণ গরীব মানুষ বঞ্চিত হলে দারিদ্র্যের সঙ্গে আয় - বৈষম্যও বেড়ে যায়। তাই বর্ধিত উৎপাদনের চাই ন্যায়সঙ্গত সমবন্টন। এই কারণেই গ্রামবাসীরা যাতে নিজেরাই সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজদের উৎপাদন বাড়িয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্রতী হয় তিনি ছিলেন তার পক্ষপাতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসৃত ভূমিস্বত্ব অনুযায়ী রায়ত-প্রজাদের উপর জমিদারদের জুলুমবাজি ও অপরিমেয় জোরজবরদস্তি এবং প্রজাউচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় চাষীর সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবহিত। তাই নিজের জমিদারীতে প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে হৃদয়ঙ্গম করতেন তাদের দুঃখবেদনা এবং সতর্ক নজর রাখতেন নিজস্ব জমিদারীর আমলা- মহাজন- জোতদারদের আচার - আচরণের উপর। তাঁর কাছে জমিদাররা ছিল 'পরশ্রমজীবী'। জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে কৃষক প্রজাদের মুক্তি দিতে তিনি ১৯০৫ খ্রিঃ নিজের জমিদারিতে প্রতিষ্ঠা করেন 'পতিসর গ্রামীণ ব্যাংক' এবং বন্ধু - বান্ধবদের সাহায্য ও ১৯১৩ খ্রিঃ প্রাপ্ত নোবেল পুরস্কারের টাকা ঐ ব্যাংকে রেখে কৃষকদের স্বল্পতর সুদে টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করেন। আবার নিজস্ব জমিদারির চৌহদ্দিতে প্রজাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সম্পদ-সংস্কৃতি– সব দিকে দৃষ্টি রেখে মুক্তহস্তে ব্যয় করেছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণে। প্রজারা খাজনা প্রদানে অক্ষম হলে তা মকুবও করেছেন। এ সবই ছিল তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনার অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যেমন কৃষির উন্নতি ব্যতীত গ্রামীণ উন্নতি অর্থহীন তেমনি আবার কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও অধিকতর বিনিয়োগ। কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহারকে তিনি যুগোপযোগী ও যুক্তিপূর্ণ বলে মনে করতেন। জমির উপবিভাজন ও খণ্ডীকরণ (Sub-division and fragmentation fo land holdings) যে উন্নততর প্রযুক্তি- নির্ভর কৃষিচাষের অন্তরায় সে

সম্পর্কে তিনি ছিলেন যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই তার রোধে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সমবায় প্রথায় চাষের উপরে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তাঁর স্মরমীয় উক্তি, ''জমির স্বত্ব ন্যায়তঃ জমিদারদের নয়– সে চাষীর...সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্রে একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।'' 'কালান্তর' -এ সমবায়ের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর কালজয়ী মন্তব্য, ''দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে।'' সমবায় সম্পর্কে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ও প্রতীতি সৃষ্টি হয় রাশিয়া সফরকালে একত্রিত কৃষি ব্যবস্থা এবং ডেনমার্ক সফরে সমবায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন প্রত্যক্ষ করে। উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ আয়ত্ত করতে তিনি নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন বিদেশে। আবার দুর্ভিক্ষ ও আকাল প্রতিরোধে তিনি উৎসাহী ছিলেন 'ধর্মগোলা' প্রতিষ্ঠায়। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা (Socio-Economic Survey) ও ছিল তাঁর পল্লীপুনর্গঠনের অঙ্গ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতন কৃষিকেন্দ্র প্রথমে প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সম্প্রসারণমূলক কার্যকালাপে কেন্দ্রীভূত হলেও পরবর্তীতে তথ্যসংগ্রহ, ভূমি সংরক্ষণ, জমির প্রকৃতি নির্ণয়, শষ্যক্রমের মাধ্যমে জমির আর্দ্রতা রক্ষা, কৃষিযন্ত্র, সেচ, জৈবিক ও রাসায়নিক সার এবং বীজের বৈজ্ঞানিকভিত্তিক ব্যবহার শেখানো হতো। স্বয়ংনির্ভরতার লক্ষ্যে কৃষিকাজের সঙ্গে শেখানো হতো গরু-ছাগল-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপন ও মৌমাছি পালন। কৃষি মেলা ও হলকর্ষন ছিল বার্ষিক উৎসবের অঙ্গ।

ভারতের মতো বিশাল দেশে বিপুল জনসমষ্টি কর্মনিয়োগের জন্য কৃষির সঙ্গে শিল্পোন্নয়নও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি গ্রামীণ, কুটির ও হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নয়ন ও প্রসারে প্রথমে শান্তিনিকেতন এবং পরে শ্রীনিকেতনে খোলেন শিল্পভবন। সেখানে কাপড় ছাপানো, কাগজ তৈরি, বই বাঁধাই, গালার কাজ, চামড়ার কাজ, বাটিক, ফল সংরক্ষণ, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প ও দারুশিল্পের শিক্ষণের কাজের সঙ্গে উৎপাদন বিপণনেরও কাজ হতো। চামড়া, কাঠ, বাঁশ, বেত প্রভৃতির রুচিশীল কারুকার্যময় উৎকর্ষ পণ্য যেখানে শীঘ্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রবিমুখ ছিলেন না– গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনে বিদেশী উন্নততর কলাকৌশল গ্রহণেও তাঁর আপত্তি ছিল না। বরং তিনি 'মানুষের রিপু'কে নিয়ন্ত্রণ করে 'যন্ত্রের বিষদাঁত' ভেঙে তার সৃষ্টি সুযোগকে 'সর্বজনের পক্ষে সুসম্পূর্ণ সুগম' করার পক্ষে ছিলেন। দেশে যাতে আধুনিক শিল্পপ্রযুক্তির প্রসার ঘটে এবং যুবকরা যাতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ ও পারদর্শী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়, তার জন্য তিনি বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী জামসেদজী টাটার উদ্যোগকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার সর্বাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে গ্রামীণ পুনর্গঠন এবং সার্বিক উন্নয়নে কৃষি, কুটির ও হস্তশিল্প, স্বাস্থ্যরক্ষা, সম্পদসৃষ্টি, ক্রয়-বিক্রয়, রাস্তা মেরামত ও তৈরী, বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ, বয়স্ক ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বৃক্ষ রোপণ তথা পুর্ণাঙ্গ মানবিক জীবন যাপনে সমবায় প্রথা প্রচলনের প্রচেষ্টা। তাঁর চিন্তায় ছিল জমিদারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে পল্লী-অর্থনীতির প্রাণসঞ্চার। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে তিনি মনে করতেন সমবায়ই একমাত্র পথ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''ঐক্যের সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে পারলে তবেই অসাম্যগত বিরোধ ও দুর্গতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।... আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নূতন আবিষ্কারেরই নাম হচ্ছে সমবায় প্রণালীতে ধন উপার্জন।'' স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও আমরা কি পেয়েছি এ সত্য উপলব্ধি করতে?

দেশনায়ক ও সাহিত্যস্রষ্টা চিন্তাবিদদের অর্থনীতিক ভাবনার প্রেক্ষাপট ছেড়ে এবার আলোচনা কেন্দ্রীভূত হবে কয়েকজন পেশাগত ও তাত্ত্বিক বাঙালী অর্থনীতিবিদের ভাবনাচিন্তায়। এই সব বিদগ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমেই আসে অধ্যাপক ড. অমিয়কুমার দাশগুপ্তের নাম।

২

(ক) অথ্যাপক ;. অমিয়কুমার দাশগুপ্ত (১৯০৩-১৯৯২)

বাংলা তথা সমগ্র ভারতের তাত্ত্বিক ও পেশাগত অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক, গবেষকও পরিকল্পনা রচয়িতাদের কাছে 'ভারতীয় অর্থনীতির জনকপ্রতিম' হিসাবে স্বমর্যাদার আসনে সমাসীন ব্যক্তিত্বের নাম অথ্যাপক ড. অমিয়কুমার দাশগুপ্ত। অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তীতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের (IMF) মুখ্য পরামর্শদাতা, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম রূপকার, দিল্লী স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস এবং পাটনার এ.এন. ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর– সর্বত্রই তিনি ছাপ রেখেছেন অসামান্য পান্ডিত্য, প্রতিভা এবং বিদগ্ধতার। শুধুমাত্র ভারতীয় অর্থনীতিক সমস্যা বিশ্লেষণেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে অর্থতত্ত্বের জটিল সমস্যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেও তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী ও পারদর্শী।

অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে অত্যধিক সরকারী হস্তক্ষেপকে ড. দাশগুপ্ত বিশেষ পছন্দ করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই উৎকৃষ্টতর গুণগতমানের উত্তরণ ঘটে, যদিও পরবর্তীকালে তাঁর এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। অর্থনীতিতে তাঁর অবদান ও চিন্তাভাবনার বিস্তৃতি অনেক হলেও স্বল্প পরিসরে তা আলোচনার সুযোগ নেই। এই অবদান ও চিন্তাভাবনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ– (১) শ্রমবিভাগ ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে তিনি ব্যাখ্যা দেন 'উদ্বৃত্ত' (Surplus) বিষয়ক এক নতুন ধারণার, যা তাঁকে এনে দেয় বিশেষ প্রসিদ্ধি (২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তীকালে ভারতে সংঘটিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ব্যাখ্যা দেন তাঁর বিখ্যাত 'War and Post War Inflation in India' রচনায় (৩) ১৯৬৫ খ্রিঃ 'পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি (Planning and Economic Growth) শীর্ষক সংকলিত গ্রন্থে ভারতীয় বাতাবরণে পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির তিনি যে তাত্ত্বিক কৌশলের ব্যাখা দেন তা কার্যতঃ ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত মহলানবিশ পরিকলনা কৌশলের ভিত্তি রচনা করে (৪) তাঁর 'মজুরি নীতি ভিত্তিকতত্ত্ব'টি (A Theory

of Wage Police) নির্ভরশীল প্রকৃত মজুরি হারের নির্ণায়ক, মজুরি ওবেতন হারে পার্থক্য, মজুরি ও দক্ষতার সম্পর্ক, ন্যূনতম জীবনভিত্তিক মজুরি, মজুরি ও উৎপাদনক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক এবং আয় ও দামনীতির মতো বিষয়গুলির উপর (৫) ১৯৮৩ খ্রিঃ প্রকাশিত 'পুঁজিবাদের পর্যায় এবং অন্যান্য রচনা' (Phases of Capitalism and other Essays) শীর্ষক গ্রন্থে তিনি আর্থিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য, পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও আর্থিক তত্ত্ব, অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা, মার্কসীয় অর্থনীতি, মার্কসের সঙ্গে কেইনসীয় অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, সামাজিক দ্বন্দ্বে গান্ধীজির মতবাদ, ভারতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে মার্কসের পুনরুৎপাদন তত্ত্বের সম্পর্ক, ভারতীয় পরিকল্পনার কাঠামো ও অগ্রাধিকার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঐ আলোচনায় ভারতে আমদানি-পরিবর্ত এবং রপ্তনি-অনুদানভিত্তিক পরিকল্পনা কৌশলকে তিনি বিশেষভাবে সমর্থন করেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শের সমন্বয়ে স্বপক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। (৬) তাঁর ১৯৮৫ খ্রিঃ প্রকাশিত 'অর্থনীতিক তত্ত্বের নবদিগন্ত' (Epoch of Economic Theory) পুস্তকে তিনি ধ্রুপদী (Classical) তত্ত্ব, মার্কস, প্রান্তিক তত্ত্ব (Marginal Theory), মার্শাল ও কেইনসীর অর্থনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এবং (৭) অর্থনীতিক আলোচনায় তিনি ছিলেন গণিত ও যুক্তিশাস্ত্র (Mathematical Techniques an concepts of Logic) ব্যবহারে আগ্রহী।

বাংলা তথা ভারতের বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদ হিসাবে অধাপক ড. অমিয়কুমার দাশগুপ্তের অর্থনীতিক চিন্তাভাবনা ও অবদান ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের অর্থনীতিক আলোচনার যে ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে তার উপর ভিত্তি করেই তাঁর একদল কৃতী ছাত্র– যথা ড. সমররঞ্জন সেন (প্রাক-ধ্রুপদী অর্থনীতি), ড. অশোক মিত্র (বন্টন অর্থনীতি), ড. অশোক রুদ্র (কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় আলোচনা ও বিশ্লেষণে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ধ্রুপদী অর্থনীতির সমর্থক ও বিশ্লেষক ড. দাশগুপ্ত ছিলেন প্রকৃত অর্থেই চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম ও মননে পরিপূর্ণ অর্থনীতিবিদ।

(খ) অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত (১৯১১ - ১৯৯৭)

অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পাঠ্য তালিকায় স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলা তথা ভারতে যে কজন অসাধারণ মেধাবী ও যশস্বী অধ্যাপক তথা অর্থনীতিবিদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্ত তার মধ্যে অগ্রগণ্য হিসাবে চিহ্নিত। শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপক দত্ত প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি এড়িয়ে কল্যাণকর অর্থনীতি কিংবা আন্তর্জাতিক বিনিময় হার অথবা শিল্পায়ন প্রাসঙ্গিকের মতো অর্থনীতির যে কোনো বিষয় প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ (Reference after reference) তুলে এমন প্রাঞ্জল ও নিখুঁতভাবে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে ন যা তাদের নিত্যনতুন ভাবনা ও চিন্তার খোরাক যোগাতো। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শ্রেণীকক্ষে তাঁর বক্তৃতা যেন বইয়ে দিতো একরাশ মুক্ত বাতাস। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান একদল উজ্জ্বল - মেধাবী ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি, যাঁরা পরবর্তীকালে স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে রেখেছেন বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অধ্যাপক দত্ত ছিলেন একাধারে যশস্বী অধ্যাপক ও দক্ষ প্রশাসক। রাজ্য সরকারের শিক্ষা অধিকারিক ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত বিভিন্ন কমিশনের সদস্য, পরামর্শদাতা ও চেয়ারম্যান। ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসাবে তাঁর প্রয়োজনীয় পরামর্শ সমৃদ্ধ করেছে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে যথোপযুক্ত নীতি প্রণয়নে। তাঁরই চিন্তাধারা ও অদম্য প্রচেষ্টাতেই ১৯৬৯ খ্রিঃ অধ্যাপক জে. পি. নায়েকের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদ' (ICSSR)। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন Indian Statistfical Institute এর কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত কার্যকরী সমিতির সদস্য। তাঁর প্রয়োজনীয় পরামর্শে সমৃদ্ধ হয় সংস্থাটি।

অধ্যাপক দত্ত শুধুমাত্র শিক্ষক, প্রশাসক ও পরামর্শদাতা হিসাবেই কৃতবিদ্য ছিলেন না, তাঁর লেখা বইগুলিতেও রয়েছে অসামান্য পান্ডিত্যের স্বাক্ষর। ইংরেজীতে লেখা তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে আছে– শিল্পায়নের অর্থনীতি নিয়ে 'Economics of Industrialisation' (১৯৫২), রপ্তানির সঙ্গে আর্থিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে এস.কে. চক্রবর্তী, এম. ভট্টাচার্য এবং জি. ঘোষকে সঙ্গী করে 'Economic Development and Export' (১৯৬২), ভারতীয় অর্থনীতিক চিন্তার বিবর্তন নিয়ে 'The Evolution of Economic Thinking in India' (১৯৬৪), ভারতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার নিরিখে রচিত রচনা সম্ভাব 'Essays in plan Economics, a Running commentary on indian Plan Experience' (১৯৬৩), আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ক রচনা 'Contents of Economic Growth' (১৯৭৭), ১৯০০-১৯৫০ সময়সীমায় বিশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতিক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে 'Indian Economic Thought : Twentieth Century Perspective 1900-1950' (১৯৭৮), মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়ের ভূমিকা নিয়ে 'Social Justice in a Mixed Economy' (১৯৮২) এবং যুগসন্ধিক্ষণে ভারতীয় পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে 'Indian Planning at the cross Roads' (১৯৯২) বইগুলিতে। অর্থনীতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর সুচিন্তিত, পান্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ পরবর্তী প্রজন্মের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত।

ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনাতেও ড. দত্ত ছিলেন সমান সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ এবং এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। অর্থনীতির কিছু জটিল বিষয় নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা তাঁর 'অর্থনীতির পথে' (১৯৭৭) বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এ ছাড়াও 'ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন' (১৯৮১), 'ধনবিজ্ঞান' (১৯৮১), 'দৃষ্টিকোণ : এক দশকের অর্থনীতির ধারাভাষ্য' (১৯৮৫) প্রভৃতি বাংলায় লেখা বইগুলিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী বর্ষে (১৯৬১) তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতিক চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। রামমোহনের অর্থনীতিক প্রসঙ্গে' (১৯৮৬) বইতে। এছাড়া বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্র পত্রিকা–যথা, বারোমাস, প্রতিক্ষণ, চতুরঙ্গ, দেশ প্রভৃতিতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অর্থনীতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ। এত বহুমুখী প্রতিভা সত্ত্বেও অধাপক দত্ত শিক্ষক হিসাবে নিজের পরিচয় দিতেই বিশেষ গর্ব অনুভব করতেন।

(গ) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩ - ১৯৭২)

অসামান্য কৃতি পরিসংখ্যানবিদ এবং Indian Statistical Institute এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নাম আলোচিত না হলে ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকলনায় অনুসৃত মডেল সম্পর্কিয় আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর প্রবর্তিত অর্থনৈতিক মডেলই ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)য় অনুসৃত হয়। এই মডেলটি ছিল একাধারে এক-ক্ষেত্রিক (One sector Model), দ্বি-ক্ষেত্রিক (Two sector Mode) এবং চতুর্ক্ষেত্রিক (Four - Sector Model)। দ্বি-ক্ষেত্রিক মডেলটির সঙ্গে ১৯২৮ খ্রিঃ সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ফেল্ডম্যান (Feldman) পরিকল্পিত মডেলের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যদিকে চতুর্ক্ষেত্রিক মডেলটি স্বল্পকালীন সময়ে বিনিয়োগ বন্টনের গাণিতিক হিসাবে অনুশীলন মাত্র। অধাপক মহলানবিশ প্রবর্তিত দ্বি-ক্ষেত্রিক মডেলটির অর্থনৈতিক দর্শন হচ্ছে– দীর্ঘকালে উচ্চতর হারে ভোগের হার বৃদ্ধি করতে হলে স্বল্পকালে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের চেয়ে বিনিয়োগমূলক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আরোপ করা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan) র তুলনায় ভৌতিক পরিকল্পনা (Physical Plan) য় বেশী আগ্রহী। ভারতে ভারী শিল্পের ভিত্তি রচিত হয় তাঁর চিন্তা প্রসূত মডেল থেকেই। মহলানবিশ প্রবর্তিত পরিকল্পনা মডেলে ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নে ও বিকাশে লৌহ-ইস্পাতের মতো ভারী ও মূলশিল্পগুলির জন্য পুঁজি-নিবিড় উৎপাদন কৌশল (Capital - intensive Production Technique) এবং ক্ষুদ্র, কুটির ও ভোগ্যপণ্য শিল্পের জন্য শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল (Labourintensive Production Technique) গৃহিত হয়। এই সমন্বিত উৎপাদন কৌশলে একই সঙ্গে উন্নয়ন হার এবং কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি সর্বোচ্চ মাত্রায় হবে বলে আশা করা হয়েছিল। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রণীত উন্নয়ন মডেলটি পরবর্তী প্রজন্মে পরিকল্পনা বিশারদ ও গবেষকদের কাছে বিশেষ অনুসন্ধিৎসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) অধ্যাপক ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন (১৯০৯ ০ ১৯৮৩)

অর্থনীতির এক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তম শিক্ষক, বিদগ্ধ গবেষক এবং দক্ষ প্রশাসক হিসাবে অধ্যাপক ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেনের পরিচিতি। বিগত শতকের পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে লন্ডন স্কুল অফ ইকনকিস্ থেকে ব্যাংক বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত অর্থনীতি অধ্যাপক আর. এস. সেয়ার্সে (Prof. R.S. Sayere)র তত্ত্বাবধানে 'অনুন্নত অর্থ বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা '(Central Banking in Underdeveloped Mony Markets) শীর্ষক গবেষণাটি সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে তৎকালীন ভারত সহ অনুন্নত দেশগুলি আর্থিক নীতি (Money Market) ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থা (Monetary System) নিয়ন্ত্রণে কি ভূমিকা পালন করবে সেটাই ছিল অধ্যাপক সেনের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর গবেষণার পর ছয় দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্বে আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত সক্রিয় শক্তিগুলির কার্যকলাপ পরবর্তিত হয়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। আর্থিক কেলেংকারী (Financial Scams) র সঙ্গে বর্তমান শতকের প্রথমেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিশ্বব্যাপী তীব্র আর্থিক সংকট (Golbal financial Cricis)। কোথাও কোথাও (Developing) দেশের পক্ষে স্থিতাবস্থা (Stability)র সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে এক শক্তিশালী হাতিয়ার (Instrument) তা কিন্তু এখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টি অধ্যাপক সেন আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর লেখা ''Central Boking in Developing Countres.'' বইতে।

অধ্যাপক ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন অধ্যাপনার সঙ্গে গবেষণাতেও ছিলেন সমান উৎসাহী। তাঁর উদ্যোগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শুরু হয় ফলিত অর্থনীতি (Applied Economic)র চর্চা। তাঁর ব্যবস্থাপনাতেই 'কলকাতা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা নিয় সম্পদিত হয় একটি সামাজিক-আর্থিক সমীক্ষা' (Socio-Economic Survey : City of Calcutta)। 'পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে শিল্প সম্পর্ক' (Industrial Relations in Jute Industry of West Bengsl) নিয়ে অপর একটি সমীক্ষাও সম্পাদিত হয় তাঁর উৎসাহেই। ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার প্রেরণা ও উৎসাহদাতা ছিলেন তিনিই। পশ্চিমবঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষা (Business Management Education)র প্রবর্তন ঘটে তাঁর হাত ধরেই। 'বাণিজ্যিক ব্যবহথাপনা ও গবেষণা সংস্থা (Institute of Business Management and Research) টির (১৯৭৬) প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। জন্মলগ্নে সংস্থাটির সভাপতির গুরুদায়িত্বও তিনি পালন করেন।

অধ্যাপক সেন অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ কর্মেও ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তাঁর সেই পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৬৮-৭৬) হিসাবে তার পরিচালনায়, ও খড়গপুর আই. আই. টি (IIT)র চেয়ারম্যান হিসাবে। এশিয়াটিক সোসাইটির চেয়ারম্যান, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর এবং ভারতীয় জীবন বীমা নিগম (LIC) -এর বোর্ডের সদস্য হিসাবেও তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা সমিতির সভাপতি হিসাবেও তাঁর কাজ বিশেষ প্রশংসাধন্য। ১৯৬৯ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় অর্থনীতি পরিষদ (Indian Economic Association)-এর তিনি নির্বাচিত সভাপতি। ১৯৮০ সালে বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদ (Bengal Economic Association) স্থাপিত হলে তিনি হন তার প্রতিষ্ঠাত সভাপতি।

(ঙ) অধ্যাপক ড. অমর্ত্যকুমার সেন (১৯৩৩–)

বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে বর্তমান শতকের হাল আমল পযন্ত অর্থনীতি জগতের বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৯৮) ভারতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. অমর্ত্যকুমার সেন। সমকালীন যে কোনো অর্থনীতিবিদের চেয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে অধ্যাপক সেনের বিদ্যাচর্চা, চিন্তাধারা ও গবেষণার ব্যাপ্তি বহু গুণ বেশী। অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে ভারতীয় অর্থনীতি, পরিকল্পনার তত্ত্ব, কৃষি অর্থনীতি, সামাজিক পছন্দের তত্ত্ব, কল্যাণমূলক অর্থনীতি, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ–সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ ও অবাধ বিচরণ এবং পান্ডিত্যের বিচ্ছুরণ। সমাজের সব

সমহ্যার পেছনেই যে অন্তর্নিহিত থাকে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক কারণ, তারই সাবলীল অথচ ক্ষুরধার মানবিক বিশ্লেষণ তাঁর ব্যাখায়। তাই তিনি অপর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ রবার্ট এম. সোলো (Robert M. Solow)-র চোখে অর্থনীতি জগতের বিবেক'।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের গবেষণালব্ধ গ্রন্থ ও নিবন্ধাদির সংখ্যা অনেক। তার কতগুলি অর্থনীতির জটিল তাত্ত্বিক আলোচনায় সমৃদ্ধ হলেও কয়েকটিতে আবার অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্রকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রশংসনীয় প্রয়াস। সামাজিক পছন্দের তত্ত্বের সঙ্গে রয়েছে জনকল্যাণকর অর্থনীতিক দারণার নিবিড়তা। উন্নয়নের অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু—দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের স্বরূপ এবং তার কারণ নির্ধারণে তাঁর নিজস্ব গবেষণালব্ধ ধ্যানধারণা। সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনীতিবিদ হিসাবে শুধুমাত্র অর্থনীতির তাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ না থেকে তাতে তিনি যুক্ত করেছেন ব্যবহারিক ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সুপারিশে। অন্যদিকে অধ্যাপক সেন তাঁর সমাজ কল্যাণমূলক ও সামাজিক পছন্দ বিষয়ক তত্ত্বের সঙ্গে সচেষ্ট হয়েছেন দর্শনভিত্তিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মেলবন্ধ ঘটাতে।

ড. সেনের কাছে শুধুমাত্র উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধিই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। বরং মানুষের যাত্রার মানের উন্নয়নই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা শ্রীবৃদ্ধি, যা আবার নির্ভর করে শিক্ষা, ব্যবস্থা, আয়ু, পুষ্টি, বাসস্থান, লিঙ্গবৈষম্যহীনতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উপর। জাতীয় আয় বৃদ্ধি তার একটি উপাদানমাত্র। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে উৎপাদন ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই উপাদন বাড়লেও তার সুফঙ তথা অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেত পারে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই এসেছে তাঁর বিখ্যাত 'এনটাইটেলমেন্ট' (Entitlement) ধারণাটি, যার অর্থ 'উৎপাদনের উপর মানুষের অধিকার'। আবার উৎপাদনের উপর মানুষের অধিকারের ভিত্তিতেই অর্জিত হয় 'কেপাবিলিটি' (Capability) বা 'সক্ষমতা'। সব দিক থেকে মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের সম্মানজনক ক্ষমতা অর্জনকেই 'সক্ষমতা' হিসাবে আথ্যায়িত করা যায়। মানুষের সক্ষমতা প্রসারই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে অধ্যাপক সেনের অভিমত। জনসংখ্যার একটি অংশের মধ্যে সক্ষমতার প্রসার না ঘটলে রাষ্ট্রকেই নিজস্ব উদ্যোগে তা প্রসারে সক্রিয় হতে সুপারিশ করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিশেষ উদ্যোগের কথা। ১৯৯৫ খ্রিঃ লেখা তাঁর 'India : Economic Development & Social opportunity গ্রন্থে ভারতের আর্থিক বৈষম্য ও জনকল্যাণের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থতার কারণ হিসাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারীর অধিকার প্রভৃতির মতো বিষয়গুলি সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ প্রক্রিয়ার অভাবকেই দায়ী করেছেন।

ড. অমর্ত্যকুমার সেনের 'এনটাইটেলমেন্ট' ও 'কেপাবিলিটি' ভিত্তিক বিশ্লেষণমুখী চিন্তাধার বিশ্ব অর্থনীতিকে যে মানবিক অভিমুখীনতার দিশা দেখিয়েছে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP) প্রস্তুত করেছে 'মানব দারিদ্র্য সূচক' (Human Poverty Index)। এই সূচক থেকে জানা যায় মানব উন্নয়নের একটি ন্যূনতম স্তরের নীচে থাকা মানুষের অবস্থা। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা প্রস্তুত 'মানব উন্নয়ন সূচক' (Human Development Index)-এর অন্তর্ভূক্ত মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু, প্রসূতি মৃত্যুর হার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ছাড়াও মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণে সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন সূচকগুলি মূলে আছে অধ্যাপক সেনের উল্লিখিত ধারণা দুটি।

সম্পদ, পরিষেবা ও জনকল্যাণের সুষম বন্টন এবং সমাজের দরিদ্রতম মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভলোবাসার উপাদান দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত জনকল্যাণকর অর্থনীতির ভিত্তি। অর্থনীতির তত্ত্ব, বাস্তব উদাহরণ ও তথ্যের সমন্বয়ে তিনি ভারত, বাংলাদেশ ও সাহার অঞ্চলের দেশগুলির দারিদ্র্য, অনাহার ও দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সমস্যার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—এসব দেশে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে কারণ খাদ্যের অভাব নয়, সম্পদের অসম বন্টনই মূলতঃ এর জন্য দায়ী। অর্থনীতির লক্ষ্যই হল মানুষের কল্যাণ। তাই আমজনতার খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তাতে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের (Welfare State) ভূমিকার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ঘটেছে তাঁর গবেষণালব্ধ জনকল্যাণকর অর্থনীতিতে। সামাজিক পছন্দের তত্ত্ব, জনকল্যাণের সংজ্ঞা, দারিদ্র্যসূচক এবং দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান নিয়ে তাঁর অসামান্য কাজ সমাজবিজ্ঞান হিসাবে জনকল্যাণকর অর্থনীতিকে দিয়েছে এক নতুন দিশা। 'জনকল্যাণ' মুখীনতার লক্ষ্য নিয়েই অর্থনীতি থেকে দর্শন, আবার দর্শন থেকে অর্থনীতিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অর্থনীতি বিষয়ক সামগ্রিক চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং গবেষণালব্ধ ফলকে তিনি গ্রন্থিত করেছেন একটি সূত্রে। সেই সূত্রটি হলো— সম্পদ, পরিষেবা, ও সম্পদের সুষম বন্টন এবং সমাজের দরিদ্রতম অংশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা। আর তাই ১৯৯৮ খ্রিঃ ৪ অক্টোবর 'রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্স' (Royal Swedish Academy of Science) তাঁর অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিতীয় বাঙালী হিসাবে নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসাবে নাম ঘোষণা করে মন্তব্য করেন, ''দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্থনীতিতে তাঁর অবদান ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ আমাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের জন্য তিনি নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান দিয়েছেন।'' অধ্যাপক সেনের অবদানের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে আগত ভবিষ্যতে সুগম করবে কল্যাণধর্মী আর্থিক জ্ঞান বিকাশের পথ।

(চ) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস (১৯৪০ –)

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্ব-উদ্ভাবিত 'গ্রামীণ ব্যাংঙ্ক' এবং তার একটি প্রকল্প 'ক্ষুদ্র ঋণ' (Micro Finance) -এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে অসামান্য অবদানের জন্য ২০০৬ খ্রিঃ ভূষিত হন নোবেল শান্তি পুরস্কারে। অধ্যাপক ইউনূসের ভাবনায় দারিদ্র্যর মধ্যে জীবন কাটাবার ভাগ্য নিয়ে কেউ জন্মায় না। দারিদ্র্য গরীব মানুষের সৃষ্টও নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষকে দরিদ্র করে রাখে। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে সীমাহীন সৃজনশীলতা ও অপার সম্ভাবনা। নিজস্ব ক্ষমতাটুকু চিনিয়ে তাকে বিকশিত হতে দিতে হয়। এই স্থির প্রজ্ঞা ও প্রতীতিই তাঁকে দারিদ্র্য বিরোধী সংগ্রামে দিয়েছে প্রেরণা। আর এই প্রেরণাই তাঁকে

অনুপ্রাণিত করেছে 'ক্ষুদ্র ঋণ' পদ্ধতি উদ্ভাবনে এবং ক্ষুদ্র ঋণের সংস্থানে তাঁর বিখ্যাত 'গ্রামীণ ব্যাংক' মডেল প্রণয়নে।

অধ্যাপক ইউনূসের মতে ভালোভাবে বাঁচা মানুষের মৌলিক অধিকার। 'ক্ষুদ্র ঋণ' –এর মতো 'সামাজিক উদ্যোগভিত্তিক মডেল' (Social Enterprise Model) এর মাধ্যমেই সম্ভব গ্রামোন্নয়ন, গ্রামীণ মানুষের শাপমুক্তি এবং দারিদ্র্যবিমোচন। তাঁর কাছে ধনীর চেয়ে গরীব মানুষের ব্যাংকের প্রয়োজন বেশী, যদিও তাদের মনে হয় 'ঋণ পরিশোধ অযোগ্য' (Credit unworthy)। সাধারণ মানুষ তত্ত্ব বোঝে না, বোঝে না অর্থনীতির গোলকধাঁধা, বোঝে ক্ষিদে, বোঝে দারিদ্র্য চায় দুমুঠো ভাত, একটু নুন। প্রথাগত ব্যাংক তাদের ঋণ দিতে অস্বীকার করলেও তাঁর অভিজ্ঞতায় দরিদ্র মানুষ কিন্তু ঋণপরিশোধে খেলাপ করে না। এই অনুভূতি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে 'গ্রামীণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠায়। এখানে এক বিশেষ ধরনের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে জামিন ছাড়াই দরিদ্র ব্যক্তিদের দেওয়া হয় ঋণ। এই ঋণের টাকার পরিমাণ কম হলেও বেকারত্ব কমিয়ে অন্তহীন সম্ভাবনার দরজা খুলে কাজের উদ্যম তৈরি করে মানুষকে সাহায্য করেছে উদ্যোগী হতে। এই উদ্যোগ মানুষের মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে নিজের ভালোর সঙ্গে প্রতিবেশীদের ভালোর জন্য দায়বদ্ধ করে তোলে। তাঁর গ্রামীণ দর্শনে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে গ্রামীণ ব্যাংকের দরজায় যেতে হয় না, বরং গ্রামীণ ব্যাংকই পৌঁছে যায় ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তির দরজায়। অধ্যাপক ইউনূসের কাছে ঋণ পাওয়াটা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। যার কিছু নেই, ঋণ প্রাপ্তিতে তারই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সমাজে বাস করা অর্ধেকের বেশী মানুষ ব্যাংকে পৌঁছাতে পারে না। ধনী ও পুরষদের সেখানে আধিপত্যের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই 'গ্রামীণ ব্যাংক' -এর অভিমুখ পাল্টে তার মালিকানা তিনি তুলে দিয়েছেন গ্রামের হত দরিদ্র মহিলাদের হাতে, সাহায্য করেছেন তাদের স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে। গ্রামীণের মাধ্যমে সম্পদ উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শিখে নিয়ে পরিবারের সবচেয়ে অনাদৃত ও অবহেলিত মহিলাটিই এখন কর্ণধার হয়ে স্বীকৃতি পেয়েছে পরিবারের সবাইকে ভালোরাখার স্বয়ংসম্পূর্ণ কান্ডারীরূপে। এখন সে পরিবারও সমাজে বিশেষ সম্ভ্রম ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর মতে, পরিবারের মহিলাদের সব কিছু গুছিয়ে কাজ করার একটি সহজাত প্রবণতা আছে। সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার না থাকলে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি (Economic Growth) ও গণতন্ত্র (Democracy) অসম্পূর্ণ থাকে।

ঋণ খেলাপের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ইউনূস প্রবর্তিত দর্শনে রয়েছে 'মানবিক মুখ' (Human Face), যা পুরোপুরি সমাজ সংস্কারের সামিল। ঋণ খেলাপকারীকে কোনো শাস্তি না দিয়ে তা পরিশোধের নির্ঘন্ট যেমন বদলে দেওয়া হয়, তেমনি আবার মোট প্রদেয় সূদ আসলের সমান হয়ে গেলে সুদ বাদ আর বেশী অর্থও নেওয়া যায় না। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা মারা গেলে 'বিল্ট ইন ইনসিওরেন্স' (Built in Insurance) নামে এক অভিনব স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে মৃতের পরিবারের ঘাড়ে কোনো রূপ দায় না চাপিয়ে আপনাআপনি তা শোধ হয়ে যায়। সমাজ সংস্কার তো বটেই– ব্যাংক ব্যবসায়ে এ এক নতুন দিশা– বৈপ্লবিক পরিবর্তন– সমগ্র বিশ্বে বোধ করি একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঋণগ্রহীতাদের জীবনে কিছু ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আনাও এই কর্মসূচির অন্তর্গত বিষয়। এর নাম 'ষোলো সিদ্ধান্ত' (Sixteen Decisions) এর মধ্যে আছে পন না নেওয়া, শিশুর জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালী, বৃক্ষরোপণ, পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাতকানা রোগ দূর করতে শিশুদের শাকসবজি খাওয়ানো প্রভৃতি।

তবে ব্যপারটা খুব সহজে হয়নি। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ প্রসারের মাধ্যমে উন্নয়নের অভিমুখে নারীদের তুলে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় অধ্যাপক ইউসূককে বারংবার সম্মুখীন হতে হয়েছে রক্ষণশীলদের প্রবল বিরোধীতার, সহ্য করতে হয়েছে তীব্র প্রতিকূলতা, অশেষ লাঞ্ছনা ও ঝড়ঝাপটা। তবু তিনি 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/ তবে একলা চলরে' বীজমন্ত্রে সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে নিজ বিশ্বাস, আদর্শ ও দর্শনে অবিচল থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন লক্ষকে ধ্রুবতারা করে। তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলায়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে ১৯৭৭ সালে পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামে নিজের বেতনের টাকায় যে বীজের সূচনা, শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে তা আজ মহীরূহে পরিণত হ'য়ে সারা বাংলাদেশে মোট ৮৬ শতাংশ এলাকা তথা ৭৫ শতাংশ গ্রামে ৬৮ লক্ষ ঋণ গ্রহীতার জীবনে এনেছে আত্মবিশ্বাস ও নতুন স্বপ্ন, যার ৯৭ শতাংশই নারী। তাই সাফল্য ও গৌরবগাথার অপর নাম অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর উদ্ভাবিত গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ। তাই বর্তমান বিশ্বের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণকামী দারিদ্র্য বিমোচক ও উন্নয়ন অভিমুখীন তাঁর এই মডেলকে ''রিল কৃতিত্ব' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে নোবেল পুরস্কার কমিটি ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে বিভূষিত করে এই উপমহাদেশের তৃতীয় বাঙালি হিসাবে তাঁকে এবং তাঁর গ্রামীণ ব্যাংককে করেছে মহিমান্বিত।

পুরানো তাত্ত্বিক ও পেশাগত বাঙালি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অধ্যাপক প্রমথনাথ ব্যানার্জী, অধ্যাপক বিন.এন. গাঙ্গুলি, অধ্যাপক জে.পি. নিয়োগী, অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, অধাপক তাপস মজুমদার, অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্ত্তী, ড. সমররঞ্জন সেন, অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী এবং অধ্যাপক বিনয় সরকার ছিলেন মূলত অধ্যাপনা ও গবেষণাতেই মনোযোগী। অবশ্য অধ্যাপক জে. পি. নিয়োগী ভারতের দ্বিতীয় অর্থ কমিশনে (১৯৬১) পালন করেন চেয়ারম্যানের গুরু দায়িত্ব। অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী ছিলেন ভারতীয় পরিকলনা কমিশনের উপদেষ্টা ও পরিকল্পনা মডেল প্রণেতা। এ ছাড়া অধ্যাপক অলককুমার ঘোষ অধ্যাপনা ছাড়াও ছিলেন ভারতীয় আর্থিক বাজার, ব্যাংক ও ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ। সত্যপ্রয়াত অধ্যাপক অম্লান দত্তের অসাধারণ দক্ষতা ছিল অর্থনৈতিক ইতিহাস ও উন্নয়ন অর্থনীতির প্রেক্ষাপট। অধ্যাপক ড. অশোককুমার রুদ্রের অবদান কৃষি অর্থনীতি ও পরিকলনা মডেলে। জীবিতদের মধ্যে সর্বাধিক বয়ঃজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্যের ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাস স্বরূপ ও পরিকল্পনার গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণে অসাধারণ বুৎপত্তি। বরিষ্ঠ ড. অশোক মিত্রের পান্ডিত্যে বিচ্ছুরণ বন্টন অর্থনীতিতে। অর্থনীতির বহুক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. অমিয়কুমার বাগচির স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অধ্যাপক ড. মিহিরকুমার রক্ষিত সমষ্টিগত (Macro) অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত। অধ্যাপক ড. অমিতকুমার ভাদুড়ি ও অধ্যাপক ড. প্রণবকুমার বর্ধন অর্থনীতির বুনিয়াদী সমস্যা ও কৃষি-শিল্পের পারস্পরিক টানাপোড়েন সম্পর্ক নির্ধারণে নিয়োজিত। পরিবেশ - অর্থনীতি নিয়ে অধাপক ড. পার্থ দাশগুপ্তের নব আঙ্গিক। অধ্যাপক ড. অভিজিৎ সেন ও অধ্যাপিকা ড.

জয়তী ঘোষ কৃষি অর্থনীতির স্বরূপ ও সমস্যাক্লিষ্টতা নিয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে গবেষণায় নিয়োজিত। অধ্যাপক ড. কৌশিক বসু ও অধ্যাপক ড. দেবরাজ রায়ের পারঙ্গমতা উন্নয়ন অর্থনীতি নিয়ে। ড. অশোক সঞ্জয় গুহ কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং ড. অশোক লাহিড়ী রাষ্ট্রসংঘের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দাবিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির পরামর্শদাতা হিসাবে কর্মরত। আশা করা যায় এঁদের কারও কারও হাত ধরেই সৃষ্টি হবে নতুন নতুন অর্থনীতিক চিন্তাভাবনা। উন্মোচিত হবে ভাবনাচিন্তার নতুন দিগন্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। অনন্য রামমোহন ঃ মুরারি ঘোষ (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৯)

২। রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা ঃ সুব্রত গুপ্ত ও পরিমল চক্রবর্তী, (মডার্ন কলাম, কলকাতা, ১৯৮৭)

৩। রবীন্দ্র প্রসঙ্গঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ঃ পঃ পঃ সরকার (বৈশাখ, ১৩৯৫)

৪। কলকাতা পুরশ্রী ঃ অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা ঃ ১৪০৫

৫। গণশক্তি ঃ অক্টোবর ১৮, ১৯৯৮

৬। গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন ঃ মুহাম্মদ ইউনূস (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪)

৭। রবিবাসরীয় আজকাল ঃ ডিসেম্বর ১০, ২০০৬

৮। IEA 87th Conference Volume, 2004

৯। Artha Beekshan (Vol. 2, No. 2, Dec. 1993)

১০। Artha Beekshan (Vol. 3, No. 2, Dec. 1994)

১১। Artha Beekshan (Vol. 4, No. 2, Dec. 1995)

১২। Artha Beekshan (Vol. 11, No. 2, sept. 2002)

১৩। Econ. Thinking of Netaji Subhas Ch. Bose (BEA Seminar, Sept. 1996)

১৪। Seminar on Dr. S. N. Sen Birth Centenary (Seminar by BEA & IBMR, Oct. 2009)

১৫। পশ্চিমবঙ্গ ঃ অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা ঃ জানুয়ারি ৮-১৫, ১৯৯৯।